মহম্মদ মহসীনের

জীবন চরিত।

শ্রীযুক্ত বাবু মহেশচন্দ্র মিত্রের

ইংরাজী বক্তৃতার সার।

শ্রীপ্রমথনাথ মিত্র কর্তৃক

অনুবাদিত ও প্রকাশিত

চুঁচুড়া সাধারণী যন্ত্রে
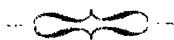
শ্রীনন্দলাল বসু কর্তৃক মুদ্রিত।

১৮৮০

মূল্য ।০ চারি আনা মাত্র।

মহম্মদ মহসীনের
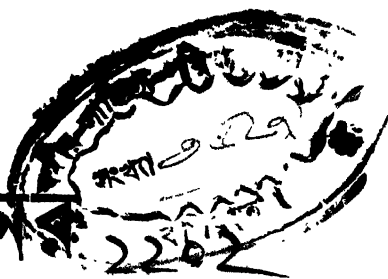
জীবন চরিত।

শ্রীযুক্ত বাবু মহেন্দ্রচন্দ্র মিত্রের

ইংরাজী বক্তৃতার সার।

শ্রীপ্রমথনাথ মিত্র কর্ত্তৃক

অনুবাদিত ও প্রকাশিত

চুঁচুড়া সাধারণী যন্ত্রে

শ্রীনন্দলাল বসু কর্ত্তৃক মুদ্রিত।

১৮৮০

মূল্য চারি আনা মাত্র।

প্রিয়তম

শ্রীযুক্ত বাবু মহেন্দ্রচন্দ্র মিত্র এম, এ, বি, এল,

মহাশয় অভিন্ন-হৃদয়েষু

বিগত ৯ই এপ্রেল সন্ধ্যার পর আমি যখন হুগলী ইনিষ্টিটীউট্ নামক সভায় বসিয়া তোমার লিখিত মহম্মদ মহসীনের জীবন বৃত্তান্ত সম্বন্ধে বক্তৃতা এবং তৎসম্বন্ধে উপস্থিত হিন্দু, মুসলমান ও খৃষ্টানের প্রসংশাবাদ শ্রবণ করি, তখনই মনে করিয়াছিলাম যে উহা যদি বঙ্গ-ভাষায় অনুবাদিত হয়, তবে উহা সাধারণের অতি আদরের সামগ্রী হইতে পারে। যখন তোমাকে বলিলাম, তখন তুমিও আমার কথার অনুমোদন করিলে এবং আমারই উপর ঐ কার্য্যের ভার অর্পণ করিলে। মহম্মদ মহসীনের অর্থ হইতে স্থাপিত হুগলী কলেজে বিদ্যা উপার্জ্জন করিয়া তুমি যেরূপ কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিলে আমিও সেই রূপ কৃতজ্ঞতা প্রকাশের সুবিধা পাইয়া তোমার কথায় স্বীকার করিয়াছি। অনুবাদ করিতে স্থানে স্থানে তোমার ভাষার ও ভাবের পরিবর্ত্তন করিয়াছি। তাহাতে বোধ হয় বিশেষ ক্ষতি হইবে না। এক্ষণে আমার কার্য্য আমি করিলাম; তবে এই ভয় পাছে মহাত্মার নামে কলঙ্ক হয়।

চন্দননগর
২০ কার্ত্তিক ১২৮৭ সাল

তোমারই
প্রমথনাথ মিত্র।

হাজি মহম্মদ মহসীনের জীবন বৃত্তান্ত।

পাঠকগণ যদ্যপি কখন হুগলী কালেজে গিয়া থাকেন তবে উহার কোন দ্বিতলস্থ গৃহে একটি চিত্রপট দেখিয়া থাকিবেন। একটি প্রবীণ মনুষ্য একখানি গ্রন্থ হস্তে বসিয়া আছেন। মুখে শান্তির আবির্ভাব। চিত্রপটটি দেখিলেই কাহার প্রতিমূর্ত্তি জানিবার ইচ্ছা জন্মে। মুখে কিছু প্রখর বুদ্ধির পরিচয় পাওয়া যায় না, কিন্তু শান্তমূর্ত্তি দেখিয়া বোধ হয় যেন তাঁহার হৃদয় বড় প্রশস্ত ছিল। দয়া ও সহৃদয়তা যেন মুখে বসান রহিয়াছে। পাঠকগণ! এই মূর্ত্তিটি হাজি মহম্মদ মহসীনের। তাঁহার দান-কার্য্যের জন্য আজিও অত্রস্থ জনগণের হৃদয়ে কৃতজ্ঞতার আবির্ভাব হয়।

মহম্মদ মহসীনের জীবন-বৃত্তান্ত বলিবার অগ্রে এই হুগলী নগরের পূর্ব্বতন অবস্থা কি রূপ ছিল ও কিরূপে তিনি এখানে আসিয়া উপস্থিত হন, তাহা বর্ণিত হইবে। পর্ত্তুগিজ সেনাপতি সম্প্রয়াণ এই নগরের স্থাপয়িতা। প্রথমে ইহার নাম গোলিন ছিল। ক্রমশঃ অন্তস্থ নকারের লোপ পাইয়া গোলী শব্দ হইতে হুগলী নাম আসিল।

সম্প্রয়াণ হুগলীর গবর্ণমেণ্টের কারাগারের নিকট ঘোল-ঘাট নামক স্থানে একটি দুর্গ নির্ম্মাণ করেন। দুর্গ ভাগি-রথী জলে নিহিত হইয়াছে। এক্ষণেও কোন কোন অংশ নদী-জলে দেখিতে পাওয়া গিয়া থাকে। ১৬৩৯ খ্রীষ্টাব্দে সাহজাহান বাদশাহের সৈন্যবর্গ এই নগর আক্র-মন করেন। কথিত আছে যে, সেই যুদ্ধে প্রায় এক সহস্র পর্ত্তুগিজ বিনষ্ট হয়! এতদ্‌ব্যতীত প্রায় চারি সহস্র নরনারী বন্দী হইয়াছিল। ইতি পূর্ব্বে সরস্বতী নদী প্রবলা ছিল; তাহার কূলে সপ্তগ্রাম নগরের তখন বড় সমৃদ্ধি ছিল। সরস্বতী-নদী ক্রমশঃ জলশূন্য হওয়াতে সপ্তগ্রামের সমৃদ্ধি ক্রমশ হ্রাস হইতে লাগিল। মোগল সম্রাট সেই জন্য তথা হইতে মহাফেজখানা উঠাইয়া আনিয়া হুগলীতে স্থাপন করিলেন। সেই অবধি হুগলী নগরের শ্রীবৃদ্ধি। বঙ্গদেশে ইংরাজেরা প্রথম উপনিবেশ এই নগরে স্থাপন করেন। ১৬৮৬ খ্রীষ্টাব্দে নবাব সৈন্যের সহিত ইংরাজ সৈন্যের কলহ হওয়াতে কাপ্তেন নিকলসন এই নগরে গোলাবৃষ্টি করেন। মুসলমানদিগের আধিপত্য সময়ে এই নগর শুদ্ধ মুর্সিদাবাদের নিকট সমৃদ্ধিতে পরা-জিত হইয়াছিল। ইহার পূর্ব্ব প্রভাবের কথা নগরস্থ মুসলমান অধিবাসীগণ আজিও আনন্দের সহিত কহিয়া থাকেন; এখানে একজন ফৌজদার থাকিতেন। উহার ক্ষমতা এক্ষণকার গবর্ণর ও মাজিষ্ট্রেটের ন্যায় ছিল। অত্রত্য একজন প্রাচীন অধিবাসীর মুখে শুনা গিয়াছে যে এক্ষণে যে স্থলে দেওয়ানি আদালত, মহাফেজখানা ও

হুগলী ব্রাঞ্চস্কুলের সম্মুখস্থ পুষ্করিণীটী আছে, তথায় খাঁ জাহাখাঁ নামক ফৌজদারের প্রকাণ্ড আবাস-ভূমি ছিল। যে খানে এক্ষণে ব্রাঞ্চস্কুল আছে, তথায় তাঁহার অন্দর বাটী ছিল। সেই সকল বাটীর হর্ম্ম্যপ্রণালী বড় প্রশংসনীয় ছিল না। মহাফেজ খানার উত্তর অংশে যে পতিত জমি আছে, তথায় হুগলীর গড় ছিল। উহার পয়-প্রণালী দেখিলে বোধ হয় যে গড়টিও বেশ দৃঢ় রূপে গঠিত হইয়াছিল। সইয়েদ চাঁদ নামক মসজীদের পশ্চিমে আজিও পূর্ব্বতন গড়ের ভগ্নাংশ দেখিতে পাওয়া যায়।

ইংরাজ হস্তে আসিবার প্রায় ৫০ বৎসর পর অবধি হুগলী নগরে মুসলমান অধিবাসীর আধিক্য ছিল। তাৎকালিক অধিবাসীদিগের মধ্যে মতিঝিলের নবাব নওরত উল্লা খাঁ, তুলা-ব্যবসায়ী জফর পন্থা, নীল-ব্যবসায়ী হাজি কারবালী, ও বারদ্বারীর অধিকারী ধনাঢ্য মিঞা আহসন প্রভৃতির নাম শুনা গিয়া থাকে। কথিত আছে, শেষোক্ত মহাত্মা, নবাব আলিবর্দ্দি খাঁর সহিত সখ্যতা বন্ধন করিয়া উভয়ে উষ্ণীষ পরিবর্ত্তন করিয়াছিলেন; এতদব্যতীত মল্লিক কাশিম-হাটের স্থাপয়িতা কাশীম আলি, জমিদার ফকরত তুজ্জার, মির সলিমান খাঁ প্রভৃতির নাম খ্যাত আছে। তাৎকালিক কাজিদিগের বংশাবলী বড় ঈশ্বর-পরায়ণ ও উন্নত-চেতা ছিল। কাজি লাল মহম্মদ এই বংশে জন্ম গ্রহণ করেন। যে সকল সুবিখ্যাত মহাশয়দিগের নাম উল্লেখ করা গেল, তাঁহাদিগের সর্ব্বাপেক্ষা আর দুই জন প্রধান লোক ছিলেন তাঁহাদিগের কথা পরে বর্ণিত হইবে।

উভয়েই সমকালীক। কিন্তু একজন নবাব, অপর ব্যক্তি ফকীর ছিলেন। উভয়েই ধনবান ; কিন্তু একজন বিলাস-প্রিয়, অপর বিষয়-বিরাগী। একজন প্রভূত ক্ষমতাশালী হইয়া নিকটস্থ লোকের উপর নিজের আধিপত্য প্রয়োগ করিতেন বলিয়া বিখ্যাত হন, অপর স্বজাতির প্রতি অনুরাগ ও নিঃস্বার্থ দান কার্য্য করিয়া দীন দুঃখীর হৃদয় অধিকার করিয়াছিলেন ; উভয়েই তৎকালে সমান সমাদৃত ছিলেন। একের নাম নবাব খাঁ জাহা খাঁ, অপরের নাম হাজি মহম্মদ মহসীন। প্রথমোক্তের নাম তৎকালে সুবিখ্যাত ছিল; কিন্তু দ্বিতীয়ের নাম আজও অবধি এ প্রদেশে জাজ্জ্বল্যমান রহিয়াছে।

হাজি মহম্মদ সম্ভ্রান্ত বংশে জন্ম গ্রহণ করেন। কথিত আছে, আগা ফজলুল্লা নামক একজন পারস্য দেশীয় ধনবান বণিক অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রারম্ভে ভারতবর্ষে আগমন করেন। তাঁহার পুত্র হাজি ফৈজুল্লা, হুগলী ও মুরসিদা-বাদে বাণিজ্য ব্যবসা দ্বারা বিলক্ষণ প্রতিপত্তি লাভ করেন ! কিন্তু পরে কোন কার্য্যগতিকে ক্রমে ধনহীন হইয়া পড়াতে হুগলীতেই থাকিয়া যান। এই সময় একটি ধন-শালিনী রমণীর সহিত তাঁহার বিলক্ষণ প্রণয় জন্মে। এই রমণীকে ও কিরূপে এখানে আসিয়া বাস করেন, তৎবৃত্তান্ত সংক্ষেপে এই স্থলে বলা যাইতেছে।

ইস্পাহান নগরের মতাহার বংশ ধার্ম্মিকতা ও অমায়িক-কতার জন্য বিশেষ প্রতিপত্তি লাভ করিয়াছিল। এই বংশের আগা মতাহার নামক একব্যক্তি দিল্লীতে আসিয়া

অবস্থিতি করেন। তিনি আরংজেব বাদশাহের খাজাঞ্চী ছিলেন। খাজনাখানার চাবি তাঁহার নিকট থাকিত। এরূপ কথিত আছে যে, তিনি সম্রাটের বড় প্রিয় ছিলেন এবং বাদশাহের বাটীতে সপরিবারে থাকিবার অনুমতি পাইয়া ছিলেন। এক দিবস আগা মতাহরের পত্নী একটি স্বপ্ন দেখেন, যেন একটি প্রাচীন ফকীর আসিয়া তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিতেছে যে, "তুমি মহরমের ব্রত পালন করিবে কি না ?" মতাহর-পত্নী কথায় উত্তর না দিয়া অশ্রু বিসর্জ্জন করিতে লাগিলেন। ফকীর বলিলেন "তোমার পরমাত্মার উদ্ধারের নিমিত্ত অন্যস্থানে গমন করিয়া তাজিয়া কার্য্য সম্পন্ন কর। মহরম নিকটবর্ত্তী, আর সময় নাই। আমাদের চক্ষে এক্ষণে চন্দ্র বেশ স্পষ্ট দেখা যাইতেছে।" স্বপ্ন ভঙ্গ হইল। মতাহর-পত্নী রোদন করিতে লাগিলেন; আগা মতাহর নিদ্রাভঙ্গে স্বপ্ন বৃত্তান্ত অবগত হইয়া কিংকর্ত্তব্য বিমূঢ় হইয়া গেলেন। এই স্বপ্ন বৃত্তান্ত প্রথমতঃ রাজ্ঞীর ও পরে সম্রাটের কর্ণগোচর হইল। আরংজেব সমস্ত বিবরণ শ্রবণ করিয়া মতাহার পত্নীর উপর অসন্তুষ্ট হওয়াতে তাঁহাকে তাজিয়া কার্য্য-সম্পাদনার্থ সপরিবারে কোন দূর স্থানে যাইতে অনুমতি দিলেন। উহাদের বাসস্থান এই হুগলী নগরে স্থাপন করিতে বলিলেন; অধিকন্তু তাঁহাদিগকে যশোহর, চীৎপুর ও অপর অপর স্থান জায়গির স্বরূপ দান করিলেন। মতাহার সপরিবারে মোগল রাজ্য হইতে এই হুগলী নগরে আসিয়া বাস করিতে লাগিলেন। তথায় তাঁহারা একটি নূতন ইমামবাড়া নির্ম্মাণ করিলেন।

মতাহারদিগের হুগলী নগরে আগমন বৃত্তান্ত এই প্রকারই শুনা গিয়াছে। আরও একরূপ প্রবন্ধ আছে যে আগা মতাহার কাশীর রাজার অধীনে কর্ম্ম করিতেন। রাজা তাঁহাকে কার্য্য নিপুণ ও অত্যন্ত বিশ্বাসী পাত্র দেখিয়া বিষয় কর্ম্মের ও সমস্ত জমিদারীর ভার তাঁহার উপর অর্পণ করেন। ঐ রাজা পরলোক গমন করিলে,আগা মতাহার রাজকুমারের অপরিণত বয়ঃক্রম হেতু সমস্ত রাজকার্য্য চালাইতে লাগিলেন। কুমার বয়ঃপ্রাপ্ত হইলে, মতাহারকে যশোহর ও চীৎপুরের তালুক দান করেন ; এক্ষণে উপরি উক্ত দুই প্রকার বিবরণ মধ্যে কোনটী সত্য, তাহা আমরা এত দীর্ঘকাল পরে লিখিত প্রমাণ অভাবে নিশ্চয় করিয়া বলিতে পারি না। যাহা হউক, আগা মতাহার এই হুগলী নগরে আসিয়া জাফর পম্বা নামক একজন তুলা ব্যবসায়ীর নিকট হইতে এক্ষণকার ইমামবাড়া বাটী যে স্থানে আছে সেই সমস্ত জমি ক্রয় করিয়া লইলেন। ইমামবাড়া নির্ম্মাণ হইবার পূর্ব্বে এই জমিতে জাফর পম্বার তুলার কুঠি ছিল। এতদ্ব্যতীত এখনকার ইমামবাড়ার ফটক যে জমিতে আছে সেই জমির উপর আনরো বিবির কতিপয় ইমারৎ ছিল। ঐ সকল ইমারৎ তৎকালে আনরো বিবির ইমামবাড়া বলিয়া খ্যাত ছিল। আগা মতাহার এই জমি এবং তৎসম্পর্কীয় দ্রব্য ও আসবাব সমস্ত ক্রয় করিলেন। হিজিরা ১১০৪ অব্দে নাজির গাহি হোসেন নামক ইমামবাড়া নির্ম্মিত হয়। ইহাতে এখনও ইমাম হোসেনের উদ্দেশে অর্চ্চনাদি করা হইয়া থাকে।

আগা মতাহার জীবনের শেষভাগে সুখী হইতে পারেন নাই। পারিবারিক বিবাদ বিসম্বাদে তিনি অনেক সময়ে এই নগর ছাড়িয়া অন্যত্র গমন করিবার বাসনা করিয়াছিলেন। সুখের মধ্যে তাঁহার প্রিয়তমা কন্যা মন্নুজান্ খানম্ তাঁহাকে অতিশয় ভক্তি করিত। তাঁহারই জন্য তিনি হুগলী ত্যাগ করিতে পারেন নাই। কথিত আছে যে, তিনি কন্যাকে একটি তাবিজ দান করিয়াছিলেন এবং বলিয়া দিয়াছিলেন যে তাঁহার মৃত্যুর পূর্ব্বে ঐ তাবিজ * ভগ্ন না করা হয়। পরে আগা মতাহারের মৃত্যু হইলে উক্ত অলঙ্কার ভগ্ন করিয়া তাহা হইতে একটি দানপত্র বাহির হয়। ঐ দানপত্রে কন্যাকে সমস্ত বিষয়ের উত্তরাধিকারিণী করা হয়। দানপত্র দাতার নিজের স্বাক্ষর ও মোহর দ্বারা আবদ্ধ। স্বামীর এই রূপ আচরণে মতাহার-পত্নী অতিশয় অসন্তুষ্ট হইয়া হুগলী নিবাসী হাজি ফয়িজুল্লা নামক এক ব্যক্তিকে বিবাহ করিলেন। এই হাজি ফয়িজুল্লার পুর্ব্ববৃত্তান্ত পূর্ব্বে কথিত হইয়াছে। এই দম্পতী হইতে হাজি মহম্মদ মহসীনের জন্ম। তিনি ১৭৩২ খ্রীষ্টাব্দে এই ধরাধামে জন্ম গ্রহণ করেন। মন্নুজান্ খানম্ হইতে তিনি আট বৎসরের ছোট। হাজি ফয়িজুল্লা যতদিন জীবিত ছিলেন, ততদিন সকলে মিলিয়া আগা মতাহারের বাটীতে বাস করিতে লাগিলেন। ইতিমধ্যে মন্নুজান্ খানমের শত্রুগণ তাঁহাকে বিষ পান করাইয়া জীবন নাশের

* অধুনা বঙ্গ-মহিলাগণের হস্তে যেরূপ তাবিজ দেখিতে পাওয়া উহার গঠন প্রণালী তাহা হইতে স্বতন্ত্র।

ষড়যন্ত্র করিতে লাগিল। মহম্মদ মহসীন ইহা অবগত হইয়া সমস্ত বৃত্তান্ত ভগ্নীকে বলিয়া দেন এবং সে অবধি গার্হস্থ্য আশ্রম ত্যাগ করিয়া সন্ন্যাস-ব্রত অবলম্বন করেন। তাহাতে মন্নুজান খানমের বিষয় সম্পত্তি রক্ষা করা বড় কঠিন হইয়া উঠিল। কিন্তু অপর একটি ঘটনা বশতঃ তিনি এই বিপদ হইতে উদ্ধার হইলেন। আগা মতাহার মৃত্যুকালে বলিয়া যান যে, তাঁহার কন্যাকে তাঁহার ভাগিনেয় মিরজা সালা উদ্দীন মহম্মদ খাঁর সহিত যেন পরিণয়-সূত্রে আবদ্ধ করা হয়। তদনুসারে তাঁহার মৃত্যুর পর মিরজা সালা উদ্দীন পারস্য দেশ হইতে আগমন করিয়া মন্নুজান খানম্‌কে বিবাহ করিলেন। এই দম্পতী সুখে কালাতিপাত করিতে লাগিলেন। এবং তাঁহাদিগের সুমহৎ দানাদি কার্য্য দ্বারা নগরবাসী সকলেরই প্রিয় হইয়া উঠিলেন। হিজিরা ১১৬৮ অব্দে মিরজা সালা উদ্দীন ইমামবাড়া বাটীটি পরিবর্দ্ধিত করিয়া তাজিয়া খানাটি নির্ম্মাণ করেন। এবং ঐ বৎসরেই হুগলীতে একটি বাজার সংস্থাপিত করেন; উহা মিরজা-সালের হাট বলিয়া খ্যাত আছে।

মহম্মদ মহসীনের জীবন-বৃত্তান্ত আর এক প্রকার শুনা গিয়াছে। অনেকে বলিয়া থাকেন যে, মহম্মদ মহসীন মুরসিদাবাদে জন্ম গ্রহণ করেন। তথায় তাঁহার পিতার মৃত্যু হওয়াতে তাঁহার মাতা হুগলীতে আসিয়া আগা মতাহারের পাণিগ্রহণ করেন। এই দম্পতী ইহতে মন্নুজান্ খানমের উৎপত্তি। এই দুই বৃত্তান্ত মধ্যে কোনটি বিশ্বাস

যোগ্য তাহা বলা বড় কঠিন। কিন্তু তুইটি প্রমাণ আমরা পাইয়াছি। ইহাতে বোধ হয় যে, মতাহারের পত্নী বিধবা হওয়াতে হাজি ফৈজুল্লাকে তিনি বিবাহ করেন। প্রথমতঃ হাজি ফৈজুল্লা এই হুগলী নগরে অনেক দিবস বাস করিয়াছিলেন; তাহার প্রমাণ স্বরূপ ফৈজুল্লার গোর ইমামবাড়ার কিয়ংদূরে এখনও দেখিতে পাওয়া যায়। দ্বিতীয়ত মন্নুজান খানম, তাঁহার ভ্রাতা মহম্মদ মহসীন অপেক্ষা কয়েক বৎসরের বড়। এই বৃত্তান্ত হুগলী নিবাসী অনেক লোকের মুখে শুনা গিয়া থাকে। মহম্মদ মহসীনের সময়ের হুগলী নিবাসী একজন প্রাচীন ব্যক্তি আমাদিগকে বলিয়াছেন যে, মন্নুজান খানম এবং মহম্মদ মহসীন এক গর্ভ-ধারিণী হইতে উৎপন্ন হয়েন নাই। ইহা কিছু গোলের কথা হইল। কেননা যদ্যপি এ কথা সত্য হয়, তাহা হইলে মহম্মদ মহসীন ইমামিয়া সরা অনুসারে মন্নুজান খানমের বিষয়ের উত্তরাধিকারী কখন হইতে পারেন না।

মহম্মদ মহসীনের যৌবনকালে তাঁহার শিক্ষা কার্য্য কিরূপ হইয়াছিল, তাহা সহজে উপলব্ধি হইতে পারে। এই সময় মুসলমান রাজ্য ক্রমশ হীন-বল হইয়া আসিতেছিল। রাজকার্য্যে বিশৃঙ্খলা হইয়া উঠিতে ছিল; বালকগণের শিক্ষার তাদৃশ বন্দোবস্ত ছিল না। ইংরাজগণ যদিও অল্পে অল্পে প্রভুত্ব বিস্তার করিতেছিলেন, কিন্তু তখনও তাঁহাদিগের শিক্ষা-প্রণালী এদেশে প্রবর্ত্তিত হয় নাই। মহম্মদ মহসীনের প্রথম শিক্ষা হুগলীতে আরম্ভ হয়। সীরাজি নামে এক ব্যক্তি নানা দেশ পর্য্যটন করিয়া হুগলীতে আসিয়া বাস

করেন। মহম্মদ মহসীন ও মন্নুজান খানম উভয়েই তাঁহার নিকট প্রথমতঃ বিদ্যা শিক্ষা করেন। সীরাজি নানা দেশের বৃত্তান্ত বর্ণনা করিয়া বালক শিষ্যের চিত্ত উত্তেজিত করিয়াছিলেন। তাহাতে মহম্মদ মহসীনের মনে দেশ ভ্রমণের বাসনা অত্যন্ত প্রবল হইয়া উঠিল। এই বাসনা পরিতৃপ্তির জন্য নানা উপায় চিন্তা করিতে লাগিলেন। এমত সময় পারিবারিক ঘটনা বশত তাঁহাকে গৃহ ত্যাগ করিতে হইল। তিনি মুরশিদাবাদে গমন করিয়া তথাকার কৃতবিদ্যগণের সহবাসে জ্ঞানার্জ্জন করিতে লাগিলেন। পরে পারস্য ও আরব দেশ ভ্রমণ করিয়া আসিলেন। আরবীয় ভাষায় তিনি সমধিক ব্যুৎপন্ন হইয়াছিলেন। কথিত আছে, তাঁহার হস্তলিপি অতীব সুন্দর ছিল। হুগলী কালেজের পুস্তকাগারে তাঁহার হস্তলিপি এখনও দেখিতে পাওয়া যায়। তাঁহার লিখিত এক খণ্ড কোরাণ এখনও অতি সুন্দর অবস্থায় আছে। এবং প্রধান প্রধান আরবী পণ্ডিতেরা আজিও তাহার প্রশংসা করিয়া থাকেন। কোন বিশ্বস্ত-সূত্রে অবগত হওয়া গিয়াছে যে, তিনি কোরাণের অন্তর্গত বিশেষ বিশেষ অংশ সহস্তে লিখিয়া ভিখারিদিগকে দান করিতেন। তাহারা সেই লেখা দেখাইয়া বিলক্ষণ উপার্জ্জন করিত।

ইতিপূর্ব্বে হাজি মহম্মদ মহসীনের মানসিক ঔৎকর্ষ্য লাভের বৃত্তান্ত বর্ণিত হইল। অতঃপর তিনি শারীরিক উন্নতির জন্য যেরূপ যত্ন করিতেন, তাহা কথিত হইবে। শরীর পরিচালনা বিষয়ে তাঁহার বিলক্ষণ দৃষ্টি ছিল। নিজের শরীর সুদৃঢ় ও বলিষ্ঠ রাখিবার বিশেষ যত্ন করিতেন। তিনি

তরবারি পরিচালন উত্তমরূপ শিক্ষা-লাভ করিয়াছিলেন। নিয়ম মত ব্যায়াম কার্য্য সম্পন্ন না করিয়া এক দিনও অতিবাহিত করিতেন না। হুগলী ইমামবাড়ার ভূতপূর্ব্ব মাতওয়ালি পরলোক গত সইয়েদ কারমত আলির মুখে শ্রুত হওয়া গিয়াছে যে, তিনি চলিতে অতিশয় সুপটু ছিলেন ও ভাল বাসিতেন।

পলাসির যুদ্ধের পর নবাবের রাজত্বের হীন দশা হইয়া আসিলে, ওমরাও এবং অপরাপর লোকে অত্যন্ত দুষ্ট স্বভাবাপন্ন হইয়া উঠিলেন। তাঁহারা মুখে ঔদার্য্যের ভাণ করিতেন, আর অন্তরে নীচ কার্য্যের পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করিতেন। বাহিরে ধর্ম্মভীত, অন্তরে দুর্দ্দান্ত দুরাচারী ছিলেন। সাধারণের আচার ব্যবহার এরূপ মন্দ হইয়াছিল যে, ভাবিলে দুঃখ হয়। নীতি সম্বন্ধে সাধারণের এরূপ শোচনীয় অবস্থা হইলেও, মহম্মদ মহসীন ও তাঁহার আনুসঙ্গীগণের স্বভাব নিষ্কলঙ্ক ছিল। তৎকালে সমাজ-শাসন ধর্ম্মের বন্ধন হইতে স্বতন্ত্র ছিল না। নীতি ও ধর্ম্ম বিভিন্ন বলিয়া তাঁহাদের জ্ঞান ছিল না। ধর্ম্ম-গ্রন্থ কোরাণ, নীতি সম্বন্ধীয় উপদেশে পরিপূর্ণ। তিনি ইমামিয়া মতানুসারে চলিতেন। ধর্ম্মই তাঁহার জীবনের সার ছিল। আচারে ফকীর ছিলেন। তাঁহার মত আন্তরিক ধর্ম্ম-পরায়ণ লোক তৎকালে পাওয়া যাইত কি না সন্দেহ। তিনি আজন্ম অবিবাহিত অবস্থায় যাপন করেন। বিবাহ-প্রথার তিনি বিরোধী ছিলেন। পারস্য সাহিত্য ও আরবীয় বিজ্ঞান আলোচনা করিয়া দিন যাপন করিতেন। প্রত্যহ কোরাণ হইতে

অংশ বিশেষ নিজ হস্তে লিখিতেন। সর্ব্বদাই ধর্ম্মকর্ম্মে রত থাকিতেন।

কথিত আছে যে, মহম্মদ মহসীন বয়ঃপ্রাপ্ত হইলে ভারতবর্ষের নগরে নগরে পরিভ্রমণ করিয়া বিভিন্ন জাতীয় ও বিভিন্ন ধর্ম্মাবলম্বী লোকের সহিত আলাপ করেন ও তাঁহাদের অবস্থা পর্য্যবেক্ষণ করিতেন। এইরূপে তিনি মানব চিত্তের সৎ ও অসৎ-বৃত্তি গুলির কার্য্য উত্তমরূপ পরীক্ষা করিতেন। কথিত আছে যে, যেখানে যত উপন্যাস শুনিয়াছিলেন, সমস্ত তাঁহার কণ্ঠস্থ ছিল। হিজিরা ১২১০ অব্দে তিনি দেশ ভ্রমণে বহির্গত হইয়া ছয় বৎসরকাল পারস্য, আরব, তুরস্ক ও মিসর দেশে পর্য্যটন করেন।

মহম্মদ মহসীন যৎকালে এই সকল দেশ-ভ্রমন-কার্য্যে নিযুক্ত ছিলেন, মন্নুজান খানমের বিষয় সম্পত্তি সেই সময়ে রক্ষণাবেক্ষণ অভাবে ক্রমশঃ বিশৃঙ্খল হইতে লাগিল। তাঁহার পতি মিরজা সালা উদ্দীন মহম্মদ খাঁ অল্প বয়সেই মানবলীলা সম্বরণ করেন। মন্নুজান খানম বৈধব্য দশায় বৈপিতৃক ভ্রাতা মহম্মদ মহসীনের স্বদেশ প্রত্যাগমন জন্য প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন। বাটী আসিবার জন্য অত্যন্ত জিদ্ করিয়া বলিয়া পাঠান; মহম্মদ মহসীন অগত্যা স্বদেশে প্রত্যাগমন করিলেন। তখন তাঁহার বয়স পঞ্চাশৎ বৎসর অতীত হইয়াছিল। কিন্তু শারীরিক ও মানসিক শক্তি বিলক্ষণ ছিল। প্রত্যাগমন সময়ে রজব আলী খাঁ ও সাকের আলি খাঁ নামক দুই জন বিচক্ষণ ও ধর্ম্মপরায়ণ বন্ধু তাঁহার সমভিব্যাহারে আসিয়াছিলেন। মহম্মদ মহসীনের প্রত্যাগমনে

হুগলী-নগরবাসী সকলেই আনন্দিত হইলেন। কথিত আছে যে, তদুপলক্ষে প্রকাশ্য রূপ উৎসব হইয়াছিল। মন্নুজানের আনন্দের সীমা ছিলনা। তিনি অনেক দিন হইতে মহম্মদ মহসীনকে তাঁহার সমস্ত সম্পত্তি দান করিবার বাসনা করেন। এক্ষনে সে বাসনা পরিপূরণের সম্ভাবনা হইল। কথিত আছে যে, তাঁহার স্বামীর মৃত্যুর পর তিনি নিজেই সমস্ত সম্পত্তির পর্য্যবেক্ষণ করিতেন। জমিদারী কার্য্য তিনি উত্তমরূপ সম্পন্ন করিতেন বলিয়া সমস্ত প্রজাবর্গ তাঁহার উপর সন্তুষ্ট ছিল। বৃদ্ধাবস্থাতে তিনি মুখে আবরণ দিয়া প্রকাশ্যস্থানে কাছারি করিতেন। তিনি অত্যন্ত বুদ্ধিমতী ও বৈষয়িক-জ্ঞানসম্পন্না ছিলেন; এবং পারস্য ভাষাতেও কথঞ্চিৎ ব্যুৎপত্তি লাভ করিয়াছিলেন। তাঁহার প্রখর বুদ্ধি সম্বন্ধে আমরা একটি গল্প শুনিয়াছি। এক দিবস নবাব খাঁ জাহান খাঁ মন্নুজান খানমের নিকটে বিবাহের প্রস্তাব করিয়া বলিয়া পাঠান। মন্নুজান খানম নবাবের সহিত বিবাহ করিতে অস্বীকার করিলেন এবং এই উত্তর দিলেন যে আমি এমন কোন লোকের সহধর্ম্মিণী হইতে ইচ্ছা করিনা, যিনি আমার প্রেমাস্পদ না হইয়া আমার অর্থের ভোগী হইতে চাহেন। সন ১২১০ সালে মন্নু জান খানম ইহলোক পরিত্যাগ করেন। তাঁহার মৃত্যু সংবাদে অনেকেই দুঃখিত হইয়াছিলেন। মহম্মদ মহসীন ভগিনীর সমস্ত বিষয়ের উত্তরাধিকারী হইলেন। সৈয়েদপুর ও সোভনাল পরগনার সমস্ত জমিদারী প্রাপ্ত হইলেন। ইতিমধ্যে

বান্দা আলি নামক এক ব্যক্তি মন্নুজান খানমের বিষয় সম্পত্তি অধিকার করিতে চেষ্টা করেন। তিনি আপনাকে মহম্মদ মিয়ার পুত্র এবং মন্নুজান খানমের পোষ্য-পুত্র বলিয়া পরিচয় দিতেন। অবশেষে মহম্মদ মহসীনের সহিত মোকদ্দমা করাতে তিনি পরাজিত হন। বান্দা আলি ইমামবাড়ার নিকটস্থ একটি বাটীতে থাকিতেন, তথায় তাঁহার মৃত্যু হয়। ঐ বাটী এখন মিউনিসিপাল-বাটী বলিয়া খ্যাত আছে।

এই সময় হইতে মহম্মদ মহসীনের চরিত্রের অন্তস্তর সুস্পষ্ট পরিলক্ষিত হইতে থাকে। তিনি প্রভূত সম্পত্তির অধীশ্বর হইয়াও, পরোপকার ব্রত সাধনে সঙ্কল্প করেন; ও সেইব্রত পালনেই জীবন যাপন করেন। পরোপকারে তাঁহার জাতি বিচার ছিল না। জ্ঞান ও মহত্ত্ব তাঁহার অন্ত-করণের পরিচায়ক। তাঁহার প্রকাশ্য ও অপ্রকাশ্য দানে তাঁহার অন্তকরণের ঔদার্য্যের পরিচয় দিত। নিজের স্বার্থ জন্য, অথবা নিজের ইচ্ছার বশীভূত হইয়া কখন পক্ষপাত করিতে তাঁহাকে দেখা যায় নাই। মানব মাত্রের প্রতি তাঁহার ভ্রাতৃভাব ছিল। দুঃখীর দুঃখ মোচন তাঁহার জীবনের কার্য্য বলিয়া জানিতেন। কথিত আছে যে, রাত্রি কালে নগরে নগরে, পথে পথে ভ্রমণ করা তাঁহার অভ্যাস ছিল। সেই সময় দীন দুঃখীদিগের অবস্থা পর্য্যবেক্ষণ করিতে করিতে যাহার ক্লেশ দেখিতেন, তাহার দুঃখ দূর করিবার জন্য চেষ্টিত হইতেন। এইরূপ ভ্রমণ করিতে করিতে তিনি এক দিবস একটি বৃদ্ধার কুটীরের নিকটবর্ত্তী

হইয়া দেখিলেন যে, ঐ ধন-হীনা নারীর অনেকগুলি সন্তান সন্ততি আছে। সকল গুলিকে প্রতিপালন করা একাকিনী বৃদ্ধার পক্ষে অত্যন্ত ক্লেশ-কর। দেখিলেন, বালকগণ আহারাভাবে চীৎকার করিতেছে, ও মাতা দুঃখে অশ্রু বিসর্জ্জন করিতেছে। তাহাদিগকে এই অবস্থাপন্ন দেখিয়া মহম্মদ মহসীনের হৃদয় দ্রবীভূত হইল। তিনি তৎক্ষণাৎ সন্তানদিগের জন্য রুটী আনিয়া দিলেন। এবং সেই অবধি তাহাদিগের প্রতিপালনের ভার নিজে লইলেন। হুগলী ইমামবাড়ার মাতোয়ালী মৌলবী আসরফ উদ্দীন আহম্মদ সাহেবের মুখে শুনা গিয়াছে;—মহসীন এক দিবস রাত্রি-যোগে ভ্রমণ করিতে করিতে এক অন্ধের কুটীরে আসিয়া উপস্থিত হন। স্বামী অন্ধ, এজন্য অর্থোপার্জ্জন করিয়া পরিবার প্রতিপালনে অক্ষম বলিয়া তাহার পত্নী তাহাকে প্রহার করিতেছে। এই দৃশ্য দর্শন করিয়া গৃহের বাহির হইতে জানালা দিয়া কতকগুলি রৌপ্য-মুদ্রা গৃহাভ্যান্তরে নিক্ষেপ করিলেন। এই ব্যাপার দর্শনে অন্ধ-পরিবারের আহ্লাদের সীমা রহিল না। কে এইরূপ মুদ্রা নিক্ষেপ করিল, তাহা দেখিতে পান নাই; কিন্তু মনে বুঝিয়াছিলেন যে এ কার্য্য মহম্মদ মহসীন ব্যতীত অন্য কাহারও দ্বারা সাধিত হয় নাই। এজন্য তাঁহারই নাম করিয়া ধন্য ধন্য করিতে লাগিলেন। মহাত্মা এইরূপে গোপনে যে কত দান করিতেন তাহার স্থিরতা নাই। এতদ্ব্যতীত তাঁহার প্রকাশ্য দানও অনেক ছিল। একজন সম্ভ্রান্ত মুসলমানের কৃপায় আমরা তাঁহার মাসিক দানের তালিকায় দেখি-

লাম যে, অনেকে বৎসরে প্রায় পাঁচ শত টাকা বৃত্তি প্রাপ্ত হইতেন। সেই সকল লোকের পুত্র, পৌত্র, প্রপৌত্র, প্রপৌত্রীগণ অদ্যাপি মহম্মদ মহসীনের ত্যক্ত সম্পত্তির উপস্বত্ব হইতে বৃত্তি প্রাপ্ত হইয়া থাকে। একজন সপ্ততি বর্ষীয় প্রাচীন পুরুষ, চারিদিকে দরিদ্র, অন্ন কৃচ্ছ্র, ভিক্ষার্থীগণ পরিবৃত হইয়া কাহারও হস্তে রৌপ্য,কাহারও হস্তে স্বর্ণমুদ্রা দান করিতেছেন, ইহা মনে মনে অনুধাবন করিলেও তৃপ্তি জন্মে। সমগ্র মানব জাতির প্রতি প্রেমে পরিপূর্ণ এরূপ চিত্ত জগতে অতি দুর্লভ। ইহাতে সমগ্র মানব জাতিকে ভ্রাতৃ-ভাবে বন্ধন করে।

হুগলীর এমামবাড়া গৃহে বৃহৎ বৃহৎ অক্ষরে লিখিত কথা গুলি পাঠ করিলে, তাঁহার দানের বিষয় অনেক অবগত হওয়া যায়। আমরা যথা সাধ্য নিম্নে তাহার অনুবাদ করিয়া দিতেছি। "আমি হাজি মহম্মদ মহসীন, হাজি ফৈজুল্লার পুত্র, আগা ফৈজুল্লার প্রপৌত্র, হুগলী নামক বন্দরে আমার আবাস-ভূমি। আমার সজ্ঞান ও নীরোগ অবস্থায় ও আমার স্বাধীন ইচ্ছা মত এই ব্যবস্থা করিতেছি যে, জেলা যশোহরের অন্তর্গত পরগণা কিসমৎ সৈয়দপুর ও সভনাল, আমার জমিদারী। হুগলী নগরে ইমামবাড়া নামক বাটী, ইমাম-বাজার ও হাট ও ইমামবাড়ার সংক্রান্ত সমস্ত জায়দাদ সমুদয় আমার। আমি ঐ সমস্ত সম্পত্তি উত্তরাধিকারী সূত্রে প্রাপ্ত হইয়াছি। এবং সেই স্বত্ব বশতঃ আমি এখনও ঐ সকলের অধিকারী। কিন্তু আমার পুত্র, প্রপৌত্র অথবা অন্য কোন আত্মীয় নাই,

যাহাকে এই সমুদায় সম্পত্তি আইন অনুসারে অর্শিতে পারে। আর আমারও এরূপ ইচ্ছা যে, যেরূপ দান কার্য্যগুলি আমার দ্বারা প্রতিষ্ঠিত হইয়া নিয়মিতরূপে সম্পন্ন হইয়া আসিতেছিল, তাহা চিরকাল সেইরূপ চলিতে থাকে। আমার বংশাবলী-ক্রমে হজ্‌রত স্থানে যেরূপ ফতেহা দেওয়া হইত, সেইরূপ চিরকাল চলিবে। আমার সমুদায় সম্পত্তি আমি পরমেশ্বরের কার্য্যে নিয়োজিত করিব। এই কার্য্যের সুবিধানের জন্য আমি এইরূপ বন্দোবস্ত করিলাম যে, সেখ মহম্মদ সাদকের পুত্র রজব আলি খাঁ ও আহম্মদ খাঁর পুত্র ফকীর আলি খাঁ—এই উভয়কে আমি বিবেচক, বিদ্যান, ধার্ম্মিক ও সৎ বলিয়া জানি। উভয়ের প্রতি আমার সম্পূর্ণ বিশ্বাস আছে। আমি আমার দান কার্য্যের পর্য্যবেক্ষণের জন্য এই উভয়কে নিযুক্ত করিলাম। ইঁহারা আমার ওফকের (দান কার্য্যের) মাতওয়ালি (পর্য্য-বেক্ষক) নিযুক্ত হইলেন। ইঁহারা উভয়ে পরস্পরের সাহায্যে, পরামর্শে ও ঐক্যমতে সমুদায়ের পর্য্যবেক্ষণ করিবেন। মাতওয়ালিদ্বয় গবর্ণমেণ্টের খাজনা দিয়া বাকি টাকা নয় অংশে বিভক্ত করিবেন। তিন অংশ সৃষ্টি কর্ত্তা হজরত সৈয়দই কৈয়ুনতের নামে ফতেহার জন্য থাকিবে। ইনি শেষ মহাপুরুষ ও ইমামের বংশের মধ্যে নিষ্পাপ। পরমেশ্বর ইহাঁকে সুখে রাখুন। মহরমের দশ দিবসের ও অন্যান্য উৎসবের জন্য যাহা ব্যয় হইবে, তাহা এই টাকা হইতে হইবে। ইমামবাড়া ও মসজিদের মেরামতি কার্য্যও এই টাকা হইতে হইবে। দুই অংশ মাতওয়ালিদিগের

নিজের ব্যয়ের জন্য প্রদত্ত হইবে। বক্রী চারি অংশের টাকা হইতে সরকারী লোক জনদিগের মাহিয়ানা ইত্যাদি খরচ পত্র হইবেক; আর এই টাকা হইতে নিজের সই করা তালিকা অনুসারে মাসিক বৃত্তি দান করা হইবেক। দৈনিক খরচ পত্র, মাসিকবৃত্তি দেওয়া না দেওয়া, লোক জন নিযুক্ত করা অথবা ছাড়াইয়া দেওয়া সম্বন্ধে মাতওয়ালীদিগের সম্পূর্ণ ক্ষমতা রহিল। যদ্যপি কোন মাতওয়ালী নিজে কার্য্য নিষ্পন্ন করিতে সক্ষম বিবেচনা না করেন, তবে তিনি অপর ব্যক্তিকে তাঁহার হইয়া কার্য্য করিবার জন্য নিযুক্ত করিতে পারেন। এই সকল কার্য্য সুচারুরূপে সম্পন্ন করিবার জন্য আমি এই দান পত্র লিখিয়া দিলাম; আবশ্যক হইলে ইহা বিচারালয়ে আমার নিদর্শন দলিল স্বরূপ হইবে। লিখিত ২৯শে বৈশাখ, ১২২১ হিজরা, ও ১২১৩ সাল।”

মহম্মদ মহসীনের প্রসিদ্ধ দান পত্রের মর্ম্ম এই রূপ; কিন্তু উত্তরোত্তর মাতওয়ালিগণের অন্যায় আচরণাদি দর্শনে ইংরাজ গবর্ণমেণ্ট ১৮১০ খ্রীষ্টাব্দের ১৯ কানুনের মতে তৌলতের তত্ত্বাবধারণের ভার নিজের হস্তে লইয়াছিলেন। ইমামবাড়ার খরচ পত্র, ও লোক জন নিয়োগ বিনিয়োগ ভার হুগলীর কালেক্টর ও মাজিষ্ট্রেট ও সিবিল সার্জ্জন সাহেবদিগের হস্তে অর্পিত হইয়াছিল। ১৮৬৩ খ্রীষ্টাব্দের ২০ আইন অনুসারে এই দানের পর্য্যবেক্ষণ ভার স্থানীয় অধ্যক্ষদিগের (Localagent) হস্তে নিয়োজিত হয়। এই সকল অধ্যক্ষ জয়েণ্ট মাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টর সাহেব।

মহম্মদ মহসীনের বিষয়ে হস্তক্ষেপ করিবার ৭ বৎসর পরে, ১৮৪৩ খ্রীষ্টাব্দে তাঁহার দানের অংশ হইতে গবর্ণমেণ্ট একটি ইংরাজি কালেজ, অতিথিশালা ও চিকিৎসালয় স্থাপন করেন। ঐ সময়ে ৬৫,৯৬৪ টাকা কালেজের ব্যয়ের নিমিত্ত স্থির হয়। এই অর্থ মাতওয়ালী দিগের ও তাজিয়ার ব্যয়ের টাকা হইতে অধিকাংশ সংগৃহীত হয়। অনেকে এই সময় কালেজ স্থাপন সম্বন্ধে আপত্তি করিয়া বলেন যে, মহম্মদ মহসীন তাজিয়ার ব্যয়ের জন্য টাকা দান করিয়া যান; কালেজ সংস্থাপন তাঁহার উদ্দেশ্য ছিল না। কিন্তু গবর্ণমেণ্ট তাঁহাদিগের কথায় মনোযোগ না করিয়া বিবেচনার কার্য্য করিয়াছেন। এই টাকা হইতে তাজিয়ার, কালেজের ও চিকিৎসালয়ের ব্যয় সমুদায়ই সম্পন্ন হইয়া থাকে। গবর্ণমেণ্ট শুদ্ধ এই করিয়াই ক্ষান্ত হন নাই। হুগলী কালেজে ভিন্ন জাতীয় ছাত্র বর্গের মাহিয়ানা যতই হউক, গবর্ণমেণ্ট মুসলমান বালকগণের বিদ্যাশিক্ষার জন্য কেবল মাত্র এক টাকা মাসিক বেতন স্থির করিয়া রাখিয়াছেন। অপরাপর কালেজের জন্য এইরূপ নিয়ম করিয়াছেন যে, অন্যান্য ছাত্রের তৃতীয়াংশ মাত্র মুসলমান ছাত্রগণের নিকট হইতে মাসিক বেতন স্বরূপ গৃহীত হইবে। হুগলী, ঢাকা ও চট্টগ্রামের মাদ্রেসা সকল এই দানের টাকা হইতে চলিতেছে। এতদ্ব্যতীত উৎকৃষ্ট মুসলমান ছাত্রগণকে এই টাকা হইতে বৃত্তি দেওয়া হইয়া থাকে।

মহম্মদ মহসীনের সৈয়দপুরে জমিদারীর আয় প্রায় ছয় সহস্র টাকা হইবে; এই টাকা নয় ভাগে বিভক্ত হয়:

এক ভাগ মাতওয়ালির মাহিনার জন্য থাকে। এক ভাগে মাদ্রেসার ব্যয় নির্ব্বাহ হয়। তিন ভাগ ধর্ম্মকর্ম্মে ব্যয়িত হয়। এই ব্যয় ভার এমামবাড়ার পাঁচ জন অধ্যক্ষের হস্তে নিহিত আছে। বাকি চারি ভাগ পূর্ব্বোক্ত স্থানীয় অধ্যক্ষদিগের হস্তে অর্পিত। এই চারি অংশের টাকা হইতে চিকিৎসালয় ও দাতব্য ঔষধালয়ের ব্যয় নির্ব্বাহ হইয়া থাকে। দুই বৎসর গত হইল, দেখা গিয়াছে যে, চিকিৎসালয়ে বৎসরে ৬,৯৭৭ টাকা ব্যয়িত হইয়াছিল। পাঁচটি মাদ্রেসার সহিত এক একটি মুসলমান ছাত্র-বাস আছে; চুঁচুড়ার ছাত্রবাসে প্রায় এক শতের উপর ছাত্র থাকে। উক্ত স্থানে সম্প্রতি গবর্ণমেণ্ট মহম্মদ মহসীনের টাকা হইতে ২৫০০০ টাকা দিয়া এই জন্য একটি স্বতন্ত্র বাটি ক্রয় করিয়া দিয়াছেন।

ধর্ম্মকর্ম্মে মহম্মদ মহসীনের অনেক টাকা ব্যয় হইয়া থাকে। মহরমের সময় এ দেশের নানা স্থনে হইতে স্ত্রীলোক ও পুরুষ হুগলিতে আসিয়া ইমাম হোসেনকে উপহার প্রদান করে। এমামবাড়ায় এই সময় প্রায় সহস্র লোক নিত্য আহার পাইয়া থাকে। প্রতি বৎসর মহরমে প্রায় ৫০০০ হইতে ৮০০০ টাকা ব্যয় হইয়া থাকে; রোমজানেও প্রায় নয় দশ সহস্র টাকা ব্যয়িত হয়; অন্যান্য কার্য্যেও ৭। ৮ সহস্র লাগে। এতদ্ব্যতীত আরও কত যে সম্পত্তি সাধারণের উপকারের জন্য দান করিয়াছেন, তাহার ইয়ত্তা নাই।

অনেক দিবস গত হইল এখন,
মহম্মদ মহসীন ত্যেজিলা জীবন ;
তথাপি তদীয় কীর্ত্তি করিছে ঘোষনা,
মৃত নর, মৃত শ্রম বিগত বাসনা।
তথাপি তাদের ফল চিরদিন তরে,
মহৎ মানসে জন্মি মঙ্গল বিতরে !

লোকে যাহাতে বিদ্যাশিক্ষা করে, তজ্জন্য মহম্মদ মহসীনের বিশেষ যত্ন ছিল। জীবিতাবস্থায় তিনি হিন্দু ও মুসলমান বালকদিগের বিদ্যাশিক্ষার জন্য একটী বিদ্যালয় স্থাপন করেন। তথায় আহম্মদ খাঁ ও বকা উল্লা খাঁ নামক সুপণ্ডিত মুন্সিদ্বয় পঠনা কার্য্যে নিযুক্ত ছিলেন। তাঁহার মৃত্যুর পর মাতওয়ালিগণ তাঁহার অর্থ হইতে এমামবাড়া স্কুল নামক একটি বিদ্যালয় স্থাপন করেন। ফ্রান্সিস টিড্ সাহেব এই বিদ্যালয়ের শিক্ষক ছিলেন। এই মহাত্মার যত্নে স্কুলের বিলক্ষণ উন্নতি হইয়াছিল। ১৮৩৬ খ্রীষ্টাব্দে ইহা হুগলি কালেজের সহিত সম্মিলিত হয়।

মহম্মদ মহসীন সঙ্গীত আলাপে আনন্দ উপভোগ করিতেন। শুনা গিয়াছে যে, বৈকালে ও সন্ধ্যার পর তিনি বন্ধু বান্ধব সমভিব্যাহারে বসিয়া ভোলা নাথ সিংহ নামক গায়কের গান শুনিতেন। ভোলা নাথকে তিনি বড় ভাল বাসিতেন। ভোলা নাথের বাটী যশোহরে ছিল।

মহম্মদ মহসীন দাস দাসীগণের প্রতি অত্যন্ত সদয় ব্যবহার করিতেন। শুনা গিয়াছে যে, গাজি নামক একজন অল্প বয়স্ক বালক তাঁহার নিকট চাকর ছিল। সে এক দিবস

তাহার ভগিনীর সাংঘাতিক পীড়ার কথা শুনিয়া প্রভু সমীপে গমন পূর্ব্বক ছুটীর প্রার্থনা করিল। প্রভু বাটী গমন অনুমতি দিয়া একটি মোড়ক হস্তে প্রদান করতবলিলেন যে,ইহাতে ঔষধি আছে,—সেবন করাইয়া দিবে। বালক বাটী গিয়া দেখে যে, তাহাতে শুদ্ধ ঔষধি আছে, এমন নহে, কযেকটী মুদ্রাও আছে।

মহম্মদ মহসীন মুসলমান ধর্ম্মাক্রান্ত বলিয়া অপর ধর্ম্মাবলম্বীদিগের প্রতি ঘৃণা প্রদর্শন করিতেন না; হিন্দুধর্ম্মাবলম্বী অনেকে তাঁহার নিকট উপকৃত হইয়াছে। নিজের অনেক গুলি আমলা হিন্দুজাতীয় ছিল। মহম্মদীয় ধর্ম্মে এক জন পরমধার্ম্মিক বলিয়া পরিগণিত হইয়াও ব্যবহারের অনেক বিষয়ে তিনি হিন্দুরে মত আচরণ করিতেন। মাংস আহারে তাঁহার অতিশয় বিদ্বেষ ছিল। মুসলমানদিগের মত নিজে দাড়ি ও গোঁপ না রাখিয়া হিন্দুদিগের মত সমুদায় কামাইয়া ফেলিতেন।

হুগলীতে আসিয়া প্রায় নয় বৎসর কাল বাস করেন। ইতিপূর্ব্বে ঢাকার নবাব তাঁহাকে ঢাকায় যাইবার জন্য বিশেষ অনুরোধ করিয়া এক খানি পত্র লেখেন। সেই অনুরোধ রক্ষা করিতে ঢাকা গমন করিয়াছিলেন, এমত কোন প্রমান পাওয়া যায় না।

মহম্মদ মহসীন এই সমস্ত সৎকার্য্য সম্পন্ন করিয়া অনেক দিন জীবিত ছিলেন। জীবনের শেষ অবস্থায় তাঁহার ধর্ম্ম বিষয়ে অধিকতর অনুরক্তি জন্মে। দয়া ও দাক্ষিণ্য গুনে তাঁহা হইতে দেশের যে কত মহোপকার সাধন হই-

য়াছে, তাহার ইয়ত্তা নাই। তিনি অন্ধের চক্ষু ও খঞ্জের পদ স্বরূপ ছিলেন।

হিজিরা ১২২৭ অব্দে তাঁহার শরীর ক্রমশঃ ভগ্ন হইয়া আসিলে রোগের লক্ষণ দেখা যাইতে লাগিল। এই বৎসর জিকিলডার চতুর্ব্বিংশতি দিবসে মহম্মদ মহসীনের জীবন দেহভার বিসর্জ্জন করিল। এই সংবাদ প্রথমতঃ হুগলী নগরে প্রচারিত হইল। ক্রমশঃ এই শোচনীয় ঘটনা দেশস্থ সকলেই অবগত হইলেন। সকলেই বুঝিলেন যে, মানব-জাতির এক প্রকৃত বন্ধু মর্ত্ত্য লোক পরিত্যাগ করিলেন।

১৮১২ খ্রীষ্টাব্দের ২৯শে নবেম্বর নগরবাসী ধনী ও নির্ধন সমভিব্যাহারে আত্মীয়বর্গ তাঁহার দেহ গোর-স্থানে লইয়া চলিল। সেই সঙ্গে রজব আলি খাঁ ও সাকের আলি খাঁ চলিলেন। সকলের মুখেই যেন অনু-রাগ, কৃতজ্ঞতা ও আন্তরিক দুঃখ বিরাজমান। সকলে সমাধি স্থানের চতুর্দ্দিকে স্থির ভাবে দণ্ডায়মান হইয়া নিঃ-শব্দে অশ্রু বিসর্জ্জন করিতে লাগিলেন। যে স্থানে আগা মতাহারের, মন্নুজান খানমের ও তাঁহার স্বামী মিরজা সালা উদ্দীন খানের সমাধি হইয়াছিল, সেই স্থানে মহম্মদ মহসীনের কবর স্থাপিত হইল। কবরের উপর আজি পর্য্যন্তও একটি মসজিদ নির্ম্মাণ হয় নাই। এবং একটী কথাও প্রস্তর ফলকে খোদিত হইয়া সমাধি স্থানের উপর স্থাপিত হয় নাই। নাই বা হইল। যাঁহার মহৎ চরিত্র হুগলী নগরের সাধারণ হৃদয়ে স্পষ্টাক্ষরে খোদিত, তাঁহার আবার কবরের উপর প্রস্তর ফলকের প্রয়োজন কি? বৎ-

সর বৎসর জিকিলডার ২৪শে তারিখে তাঁহার জন্য ফতেহা কার্য্য সম্পন্ন হইয়া থাকে। তাঁহার জন্য ঈশ্বরের নিকট এইরূপ প্রার্থনা হইয়া থাকে ;—

"জগদীশ্বর তাঁহার ও তাঁহার আত্মীয় স্বজনগণের উপর অধিকতর প্রেম দৃষ্টি করুন। শেষ-অবতার মহম্মদ! এই মহাত্মার নিকট শান্তি যেন চিরবিরাজিত থাকে। মহম্মদের অনুরোধে মহম্মদ মহসীন যেন বিচারের দিন শান্তি লাভ করেন। প্রভো! তাঁহাকে মহম্মদ হইতে স্বতন্ত্র করিও না। মহম্মদের বংশের উপর যে অত্যাচার করিবে, তাহার উপর যেন ঈশ্বরের অভিসম্পাত পতিত হয়। ঈশ্বর! স্বর্গে মহম্মদ মহসীন যেন চিরদিন সুখে ও শান্তিতে কাল অতিবাহিত করেন।"

মহম্মদ মহসীনের জীবন চরিত আমরা যথা সাধ্য লিপিবদ্ধ করিলাম। এই চরিত্র পাঠে বহুবিধ ফল আছে। ধনীগণ ধনের সদ্ব্যবহার শিক্ষা করিবেন; সৎকার্য্য না করিলে মানব জীবন সার্থক হয় না।

আমরা এক্ষণে মহম্মদ মহসীনের প্রদত্ত অর্থের ব্যবহার জন্য যে যে মাতওয়ালিগণ নিযুক্ত ছিলেন, তাঁহাদিগের বিষয় সংক্ষেপে বর্ণনা করিয়া প্রস্তাবের উপসংহার করিব।

মহম্মদ মহসীনের জীবিতাবস্থায় রজব আলি খাঁ ও সাকের আলি খাঁ তাঁহার বিষয়াদি পর্য্যবেক্ষণ করেন। তাঁহারা তাঁহার মৃত্যুর পর ও অনেক দিবস এই কার্য্য ভার বহন করেন। সন ১২২০ সালে সাকের আলি খাঁর মৃত্যু হইলে রজব আলি খাঁ ও সাকের আলির পুত্র বাকের আলী খাঁ—

এই কার্য্য সম্পন্ন করিতে থাকেন। ঐ বৎসর ১লা মাঘ তারিখে রজব আলি খাঁ, তদীয় পুত্র ওয়াসিফ আলি খাঁকে তাঁহার কার্য্যে নিযুক্ত করেন। শেষোক্ত মহাশয়ের অপর একটি নাম মোগল জান। এই ভার অর্পণের সময় রজব আলি একটি দানপত্র লিখিয়া যান। এই দানপত্রে তাহার বৈষয়িক কার্য্যে বিচক্ষণতার বিশেষ পরিচয় পাওয়া যায়। ভূতপূর্ব্ব সদর দেওয়ানি আদালতে এই দানপত্র লইয়া অনেক তর্ক বিতর্ক হয়। বাকের আলি ও সাকের আলি উভয়েই মহম্মদ মহসীনের বিষয়াদি তত্ত্বাবধারণের ভার প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। কিন্তু ১৮১০ খ্রীষ্টাব্দের ১৯ নং রেগুলেসন অনুসারে কলিকাতার বোর্ড অব রেবিনিউ এবং হুগলীর কলেক্টর, ১৮১৫ খ্রীষ্টাব্দের ১৬ ই নবেম্বর দিবসে সৈয়দ আলি* আকবর খাঁ নামক এক ব্যক্তিকে আমিন ও অধ্যক্ষ স্বরূপ নিযুক্ত করিয়া তাঁহার উপর লোক জনের মাহিয়ানা ও মাতওয়ালিদিগের প্রাপ্য টাকা দিবার আজ্ঞা দিলেন। পরে এই বিষয়-সংক্রান্ত ভূমি ইত্যাদিও তাঁহার কর্ত্তৃত্বে অর্পিত হইল। কিন্তু ইহাতে এই ফল হইল যে, গবর্ণমেণ্টের খাজনা অনেক দিনের বাকি পড়িতে লাগিল। তত্ত্বাবধারণ আর ভাল রূপ হয় না, অনেক কার্য্য পড়িয়া রহিল। বোধ হয়, কর্ত্তৃপক্ষের এ বিষয়ে চৈতন্য হওয়াতে ১৮১৬ খ্রীষ্টাব্দের ৯ ই জুলাই যশোহরের কালেক্টর আবার মাতোয়ালিদিগের হস্তে সমুদায় কার্য্যের ভার ন্যস্ত করিলেন। কলিকাতার বোর্ড অব রেবেনিউ এই কার্য্যের অনুমোদন

করিলেন। বাকের আলি ও ওয়াসিফ আলি মাতয়ালি-দ্বয় ঋণ করিয়া কোম্পানির খাজনার পরিশোধ করিলেন। কিন্তু দুই বৎসর পরে ১৮১৮ খ্রীষ্টাব্দে বোর্ড আবার মাতোয়ালিদ্বয়ের হস্ত হইতে কার্য্যের ভার কাড়িয়া লইয়া সৈয়দ আলি আকবর খাঁর হস্তে অর্পণ করিলেন। এদিকে বাকের আলি উন্মাদ রোগগ্রস্ত হইয়া রহিলেন। ওয়াসিফ আলি কর্ত্তৃত্ব পাইবার জন্য বিশেষ চেষ্টা করিতে লাগিলেন; কিন্তু বোর্ড তাঁহার কথায় কর্ণপাত করিলেন না দেখিয়া এই বলিয়া নালিস করিলেন যে, তাঁহার হস্ত হইতে কর্ত্তৃত্ব গ্রহণ করিয়া গবর্ণমেণ্ট আইনের বহির্ভূত কার্য্য করিয়াছেন। তদানীন্তন জেলার জজ স্মাইথ সাহেবের বিচারে তিনি মোকদ্দমায় হারিয়া যান। প্রিবি কৌন্সিলে আপীল করিলে সেখানেও মোকদ্দমায় তাঁহার পরাজয় হইল। প্রায় ৭ বৎসর কাল এই মোকদ্দমা চলিয়াছিল। এইসময়ে মহম্মদ মহসীনের সম্পত্তির মুনফার অতি অল্প ভাগ মাত্র ব্যয়িত হইয়াছিল। সুতরাং এই ৭ বৎসর পরে দেখা গেল যে, প্রায় সাত লক্ষ টাকা জমিয়াছে। পূর্ব্ব সম্পত্তি ও এই টাকা হইতে প্রায় দ্বিগুণ আয় হইল। বোর্ড এই সময় গবর্ণমেণ্টে লিখিলেন যে, যদি এই টাকা হইতে একটি মাদ্রাসা স্থাপন করা যায় তাহা হইলে, মহম্মদ মহসীনের নাম চিরস্মরণীয় হইবে এবং তাঁহার নামে অনেকে বিদ্যা লাভ করিতে পারিবে। চেষ্টা করিলে এই স্কুলে ক্রমশ য়ুরোপীয় বিজ্ঞান চর্চ্চাও প্রবর্ত্তিত করা যাইতে পারিবে। এই প্রস্তাবের বিচার ভার সাধা-

রণ শিক্ষা সভার কমিটির উপর অর্পিত হইল। কমিটি জিজ্ঞাসা করিলেন যে, উক্ত ৭,৪৭,০১০৲ সাত লক্ষ সাত চল্লিশ সহস্র দশ টাকা কলেজের জন্য ব্যয় হইবে কি উহার এমামবাড়ার আয়ের সহিত সম্মিলিত হইবে? কমিটির বিবেচনায় স্থির হইল যে, যদিও মহম্মদ মহসীনের দানপত্রে মাদ্রাসার কোন উল্লেখ নাই, কিন্তু দাতার প্রধান উদ্দেশ্যের প্রতি লক্ষ রাখিয়া যদি মুসলমানদিগের সাধারণের হিতের নিমিত্ত অপর কোন উপকারী বিষয়ে ব্যয়িত হয় তবে তাহা বরং প্রার্থনীয়। এতরূপ তর্ক বিতর্ক ও লেখা লেখি হইতে প্রায় তিন বৎসর গত হইল। এই সময় মধ্যে সুদে আসলে টাকা বর্দ্ধিত হইয়া ৮;৬১,১০০৲ অষ্ট লক্ষ একষষ্টী সহস্র এক শত হইয়া উঠিল। অনেক বিবেচনার পর গবর্ণর জেনারেল সাহেব সাধারণ শিক্ষার উপযোগী একটি কলেজ স্থাপনের অনুমতি করিলেন।

গবর্ণর জেনারেল স্যার চরলস মেটকাফ ১৮৩৫ খ্রীষ্টাব্দের অক্টোবর মাসে এক খানি পত্রে মহম্মদ মহসীনের যশোহরের সম্পত্তির আয় কিরূপে ব্যয় হইবে, তাহার একটি বন্দোবস্ত করিয়া দেন। সেই বন্দোবস্ত এখনও চলিয়া আসিতেছে। মেটকাফ সাহেব বলেন যে, এই উদ্বৃত্ত টাকা হইতে কালেজ স্থাপিত হইলে দানপত্রের মর্ম্মের কোন ব্যত্যয় ঘটিবে না। এই মত প্রকাশের পর ১৮৩৬ খ্রীষ্টাব্দের ১ লা আগষ্ট হুগলি কলেজ নামক প্রসিদ্ধ শিক্ষালয় স্থাপিত হইল।

সাইয়দ আলি আকবর খাঁ প্রায় ২৪ বৎসর কাল

ওয়াকেফ সম্পত্তির পর্য্যবেক্ষণ করিলে, গবর্ণমেণ্টের অনুমতি অনুসারে তিনি উক্ত কর্ম্ম হইতে চ্যুত হইলেন। মৌলবী জমিরুদ্দীন খাঁ তাঁহার পদে নিযুক্ত হয়েন। ইহার অপর একটি নাম মিরুমিয়া। তিনি দশ মাস কাল এই কার্য্য করেন। হুগলী নগরের অনেকে তাঁহাকে প্রতিদিন দীনদিগকে আহার প্রদান করিতে দেখিয়াছেন। তাহার পর সৈয়দ কেরামত আলি এই কার্য্যে নিযুক্ত হন। ইনি এক জন সুদক্ষ ও সুপণ্ডিত লোক ছিলেন। পারস্য ও আরবী ভাষা উত্তমরূপ জানিতেন; এতদ্ব্যতীত গণিতশাস্ত্রে বহুল পারদর্শিতা ছিল। তিনি একবার একটি সরল-রৈখিক কোনকে তিনভাগে সমান বিভক্ত করিবার চেষ্টা করিয়া ছিলেন। তাঁহার উপপত্তি সাইয়েদ আমীর আলি পারস্য হইতে ইংরেজি ভাষায় অনুবাদ করেন। সাইয়েদ কেরামত আলি ইতিপূর্ব্বে জোয়ানপুরের সদর আমীন ছিলেন। এবং গবর্ণমেণ্টের বড় প্রিয়পাত্র ছিলেন বলিয়া মহম্মদ মহসীনের সম্পত্তির তত্ত্বাবধারক মানোনীত হইলেন। হুগলী এমামবাড়ার সৌন্দর্য্য তাঁহা হইতে অনেক বর্দ্ধিত হইয়াছে; যদিও তাঁহার জীবনের শেষ অবস্থায় নগরস্থ হিন্দু অধিবাসীগণ তাঁহার প্রতি বিশেষ অনুরক্ত ছিলেন না, কিন্তু মুসলমানগণ সকলেই তাঁহাকে বিশেষ শ্রদ্ধা করিত। তিনি ১৮৭৫ খ্রীষ্টাব্দের ১০ই আগষ্ট মানবলীলা সম্বরণ করেন। তাঁহার মৃত্যুর পর মৌলবী আসরফ উদ্দীন আহম্মদ মাতওয়ালী পদে নিযুক্ত হইয়াছেন। ইনি সুবিখ্যাত নবাব আমীর আলী খাঁ বাহাদুরের পুত্র। নিজ অমায়িকতা গুণে ইনি নগরস্থ সকলের প্রিয় হইয়া উঠিয়াছেন।

সমাপ্ত।

বিজ্ঞাপন।

এই পুস্তক সাধারণী কার্য্যালয়ে, হুগলির কালেক্টরিতে শ্রীযুক্ত বাবু কালিপ্রসন্ন সেনের নিকট এবং চন্দননগর পুস্তকাগারে শ্রীযুক্ত বাবু পূর্ণচন্দ্র চক্রবর্ত্তীর নিকট পাওয়া যাইবে।

শ্রীপ্রমথনাথ মিত্র।